BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link :: 10.70798/Bijmrd/01010001

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 1 | Issue: 1 | December 2023 | e-ISSN: 2584-1890

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কে বাঁচায়, কে বাঁচে!’ : মন্বন্তরের উপাখ্যান ও মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক বিবর্তন

মানস কান্তি প্রামানিক

Research Scholar, Department of Education, RKDF University, Ranchi

Email: pramanikmk@rediffmail.com

Abstract: *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘কে বাঁচায়, কে বাঁচে!’ গল্পটি তাঁর লেখক-জীবন ও মানসিকতার এক সন্ধিলগ্নের ফসল। গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে এমন এক সংকটলগ্নে ও তার রুদ্ধশ্বাস পরিবেশের পটভূমিকায় রচিত যা কল্লোলের কালে ও অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের অথচ প্রাক-যুদ্ধপর্বের লেখকদের মনোভঙ্গির বিকাশে একটি বিশিষ্ট স্তর চিহ্নিত করতে সক্ষম। গল্পটি ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। বাংলার মন্বন্তরের প্রেক্ষিত সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও সমাজচেতনার নিরিখে বলা যায় গল্পটি আসলেই হয়ে উঠেছে মন্বন্তরের উপাখ্যান এবং গল্পের প্রধান চরিত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কার্যকলাপ হয়ে উঠেছে তার মানসিক বিবর্তনের অনন্য দলিল।*

Keywords: *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কে বাঁচায়, কে বাঁচে!, মন্বন্তর, মৃত্যুঞ্জয়.*

DISCUSSION: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ধরা পড়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর পঞ্চাশের মন্বন্তরের বাস্তব চিত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের করাল প্রভাব ভারতে ততটাও অনুভূত না হলেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের অর্থনীতিকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বোমার আতঙ্ক আর দূর্ভিক্ষ, মন্দা, অর্থনৈতিক ধ্বস সব মিলিয়ে ভারতের অবস্থা হয়ে উঠেছিল দূর্বিষহ। সমস্ত গ্রাম জুড়ে দূর্ভিক্ষের করাল ছায়া ছড়িয়ে পড়েছিল। না ছিল অন্ন, না ছিল বস্ত্র, তার উপর মন্দার বাজারে রুজি-রোজগারের সমস্যাও গ্রামবাসীদের চিন্তিত করে তুলেছিল। একদিকে দূর্ভিক্ষের বীভৎসতা আর অন্যদিকে কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্য -সব মিলিয়ে অন্নাভাবে মানুষ মরতে বসেছিল। আখ্যানচর্চার শুরু থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুধাগ্রস্ত মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, নিরীক্ষণ করেছেন ক্ষুধাগ্রস্তের মনস্তত্ব। সেই লড়াই নেহাত ক্ষুধাপীড়িতের যাতনার বর্ণনা নয়, ক্ষুধাপীড়িতের আর্তি, ফরিয়াদ বা শুধুমাত্র ক্ষুধার সঙ্গে লড়াইয়ের নানা ধরনও নয়। ক্ষুধা নিয়ে কখনও বিরাগ, কখনও ঔদাসীন্য, কখনও ক্ষুধা ছিঁড়ে ফেলবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্রদের, অথবা মানিকবাবুর মানুষেরাই প্রায়শই আদিম হিংস্রতায় আক্রমণ করবে ক্ষুধাকে। অথবা ক্ষুধাই হয়ে উঠবে জীবনযুদ্ধের পাঠ নেওয়ার বুনিয়াদী অধ্যায়। আর ক্ষুধার সঙ্গে তাঁর মানুষদের এইসব নিরন্তর সংলাপ, অথবা সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ধারণে যখন মগ্ন হয় তাঁর গদ্য, সেও যেন রচনা করে নেয় এক ব্যূহ। যে ব্যূহ তার জটিলতাকে আশ্চর্য সারল্যে ঢেকে রাখে, পাঠককে অনায়াসে টেনে নেয় তার গহনে।

অন্নাভাবে অসংখ্য মানুষের মরে যাওয়াই যে সমাজের সমাকীর্ণ বাস্তবতা, সেই সমাজকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘সুযোগ’ শব্দটা নিশ্চয়ই খুব নির্দয়। তবু সুযোগ তো বটেই, গ্রাম নিবাসী হলে অন্নাভাবের ক্ষুধা তাঁকেই ছুঁত, কিন্তু শহরবাসী (তখন তিনি টালিগঞ্জে) হওয়ার সুবাদে তিনি ছুঁয়ে দেখার দূরত্বেই দেখবার সুযোগ পেলেন অন্নাভাবে মৃত অথবা মুমূর্ষু কয়েক লক্ষ মানুষকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টির দিকে দিব্যি ঝুঁকে গেছেন। সুতরাং তিনি শুধু দেখবেন কেন ? তিনি ক্ষুধাজনিত ওই মরণের মোচ্ছবের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কারণ খুঁজতে চাইলেন, লাখো মানুষের খিদেয় মরে

যাওয়ার যাতনাকে ধারণ করলেন, লিখে রাখলেন তার সবথেকে বিশ্বস্ত আখ্যান দলিল। সামাজিকভাবে, অর্থনীতিগতভাবে এবং রাজনীতিগতভাবে মন্বন্তরী ক্ষুধার সবথেকে বিশ্বস্ত আখ্যান-দলিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে ৪৩-পূর্ববর্তী দু-দশক আগে থেকেই, প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দুর্ভিক্ষপ্রবণ একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল অবিভক্ত বাংলাদেশে। অর্থনীতিবিদ এ. রঙ্গস্বামী একটি নিবন্ধে এ পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে ভেঙে গড়ে একটি শব্দের ব্যবহার করেছেন- *'Famishness'*। এই *'Famishness'* বা দুর্ভিক্ষপ্রবণ পরিস্থিতিতে ভিটেমাটি ছিড়ে আসা অগনণ মানুষের স্রোত অথবা যেন চড়ায় আটকে পড়া মরণের ঝাঁক, যেগুলি দুর্ভিক্ষের দৃশ্যমান চিহ্ন, দেখা যায় না কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের সকল শক্তি ক্রমাগত নিঃশেষ হয়ে যাবে সমাজের বিপুল এক মানবসমাহার থেকে। অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ ক্রমাগত স্থানান্তরিত হয় গ্রামীণ দরিদ্রদের হাত থেকে ধনীদের হাতে। বাংলাদশের ক্ষেত্রে তেমনটা অনেকখানিই ঘটেছিল গ্রামীণ দরিদ্রদের হাত থেকে শহরের ধনীদের হাতে। তবে এহেন পরিস্থিতিতেই জনতার সেই অংশগুলিই ক্রমশ তৈরি হয়ে যায় যারা ক্রমশ উৎপাদনের এবং প্রতিরোধক্ষমতায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে একসময় দলে দলে মরে যাওয়ার জন্য মজুত থাকবে। এই খিদের মনস্তত্ত্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অর্ধাহারের মধ্যেই মানুষ এমন কল্পনায়, ভাবনায় নৃশংসতায় আতঙ্কে পৌঁছতে পারে, অনাহারে পারে না, কারণ অনাহার তার অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেয় বিজ্ঞানের ছাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন রাজনৈতিক অর্থনীতির নিবিড়তর নিরীক্ষণ আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন কখনও পর্যবেক্ষণ ও অনুভব দিয়ে এবং অবশ্যই নিয়মিত অধ্যয়ন দিয়ে। পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘটিয়ে তোলা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একটি অংশকে তাঁর গণিতপ্রেমী মেধা দিয়ে তখনই বুঝে নিয়েছেন এবং আখ্যানের গদ্যের সকল মায়া সরিয়ে যেন সমাজবিজ্ঞানের গদ্য দিয়ে সেই বিপর্যয়কে প্রকাশ করেছেন। সে বিষয়টি হল ফসলের বাণিজ্যিক পণ্যায়ন। দুর্ভীক্ষ-পূর্ববর্তী কয়েকটি দশকে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চাপেই বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জেরেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। এই প্রক্রিয়ায় যখন খাদ্যের ঘাটতি ক্রমশ নিশ্চিত করে ফেলল, তখনই দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরগুলিতে বাণিজ্যিক পণ্যায়নের চাপ এসে পড়ল খাদ্যশস্যের এই *'Foreed monitarisation'*

'আত্মহত্যার অধিকার', 'প্রাগৈতিহাসিক' -দু'টি গল্পে এবং এই সময়ের অন্যান্য গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তি-চরিত্র-নির্ভর জীবন-ভাবনার বিচিত্র স্বভাবের সন্ধানী। সে জীবন-ভাবনা আদিমতম স্বভাবের কোনো বৃত্তির বিকাশের হতে পারে, সভ্য সমাজে তার অস্তিত্ব জ্বালায়-যন্ত্রণায় বিশ্বাসী রূপে অন্য তাৎপর্যে বিচারণাও হতে পারে। মোট কথা, উল্লিখিত দুই গল্পে জীবনের চরম রূপের ব্যাখ্যার প্রয়াস স্পষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের গল্পে এই লেখক ব্যক্তিকেই নিয়েছেন। আদিম জীবন-ব্যাখ্যা বা জীবন-বিলাসী কোনো প্রেরণা বা মানসিকতাকে সবল করতে উৎসুক হয়নি। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পে ব্যক্তি-মানুষকে নিয়ে এসেছেন সমষ্টি মানুষের ভিড়ে। আদিম জীবন ও জৈব জীবন থেকে সূত্র ধরে সমষ্টি মানুষের ভিড়ে ব্যক্তিকে হারিয়ে দেওয়ার এই ঘটনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুদ্ধোত্তর কালের বিষয়-ভাবনার সূত্র-সংযোগকারী বিষয় নিশ্চয়ই। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্প তারই এক শিল্পিত ভিত্তিরূপ। এই গল্পটি সর্বপ্রথম পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'মহামন্বন্তর' গ্রন্থে প্রকাশিত। এই সংকলন গ্রন্থটির প্রকাশকাল মার্চ, ১৯৪৪। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে তার ধ্বংসের ক্রিয়ায় উজ্জ্বল। এর প্রকাশকাল তেতাল্লিশের মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ স্বভাব সমানে বয়ে নিয়ে চলেছে তখনো।

অবশ্য মন্বন্তরই এই গল্পে উদ্দীপন বিভাবের কাজ করেছে। গল্পটি আকারে বেশ ছোট প্রকৃতিতে গভীরতম তাৎপর্যবাহী। কাহিনী অংশ এর সামান্যই। গল্পের প্লট-গঠনে যেটুকু প্রয়োজন, তার বাড়তি এতটুকুও ঘটনা চরিত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি এর ঘটেনি। অর্থাৎ এই গল্পের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ নিরাসক্তি স্পষ্টরূপে আছে। প্লট চরিত্রকে আশ্রয় করে গভীর-নিবিড় শিল্পের বন্ধন পেয়েছে। চরিত্রকেন্দ্রিক সামান্যতম কাহিনীর রেশটুকু বিশেষ এক নায়ক চরিত্রে মনোভাবনার শেষ অভিব্যক্তিতেই জ্বলে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনোই কাহিনীকে একমাত্র কৌশল মনে করেননি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে গল্প লিখতে বসে। প্রাক যুদ্ধকালের ছোটগল্পের কিছু সংহত কাহিনী ছিল, এই পর্বে তাকেও বর্জন করতে উৎসাহী। তাঁর অদ্ভুত নিরাসক্তি যথার্থ বৈজ্ঞানিকের মতোই। একান্তভাবে বিষয় ও বক্তব্যের প্রয়োজনেই কাহিনী ও ঘটনার বাড়তি অংশ বর্জনে তিনি এক নির্মম সচেতন শিল্পী। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের প্লট-গঠন পরিকল্পনায় সে শিল্পী-স্বভাব স্পষ্ট।

গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয় সে সময়ের মোটা মাইনের মধ্যবিত্ত চাকুরে। সে মানবতাবোধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। অফিস যাওয়ার পথে একদিন সে প্রত্যক্ষভাবে একটি মানুষের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা দেখে। তার প্রতিক্রিয়ায় সে শারীরিক ও মানসিক দু'ভাবেই

অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই অসুস্থতা তাকে অসহায় করে তোলে। সে এমন মৃত্যু বন্ধ করার জন্যে নিজের খাবার, পরিবারের খাদ্য কমিয়ে বাইরের লোককে বাঁচাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও তার অসহায়তা! অফিসের মাহিনা সে রিলিফ ফান্ডে দেয়, ক্রমশ তার সংসার অচল হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের অফিস-বন্ধু নিখিল সেই সংসার সামলাতে এসেও বোঝে, মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রীও স্বামীর ভাবনার সমান অংশীদার। মৃত্যুঞ্জয় ক্রমশ কলকাতার পথে পথে ঘুরে লঙ্গরখানা দেখে, অন্নক্লিষ্ট মানুষদের সঙ্গে কথা বলে অসহায়তা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করে। সে অফিস ছাড়ে, বাড়ি ত্যাগ করে ফুটপাতে আরও দশজনের মধ্যে থেকে মগ হাতে করে লঙ্গরখানার খিচুড়ি ভিক্ষে করে দলের ভিখিরিদের মতোই। এখানেই গল্পের শেষ। মূল ঘটনা মন্বন্তর একটি মানুষের অসহায় মৃত্যু এবং সেই চিত্র প্রত্যক্ষভাবে দেখে মৃত্যুঞ্জয়ের তীব্রতম মানস প্রতিক্রিয়া। বাকি গল্পের যে মোক্ষম টান তা চরিত্রের অসম্ভব *'inert'* স্বভাবেই সম্ভব হয়েছে। সমগ্র গল্পে চরিত্রই ঘটনার জন্ম দিয়েছে, আবার তাকে অবলীলায় পরিত্যাগ করেছে। সবশেষে কোন ঘটনার দ্যোতনা নেই। আছে চরিত্রের অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণত রূপ।

গল্পে চরিত্রসংখ্যা মাত্র তিনটি- মৃত্যুঞ্জয়, তার স্ত্রী- গল্পে চিহ্নিত টুনুর মা, আর অফিসের সহকর্মী নিখিল। মৃত্যুঞ্জয় চরিত্রের অমোঘ টানে বাকি দুই চরিত্র যা কিছুটা নড়াচড়া করেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনের যে ট্র্যাজেডি, তা কোনো কাহিনী ও ঘটনায় নয়, চরিত্রের মানব্য-ভাবনার অনাবিল লালনে। মহত্তম মানবতাবোধের আঘাতেই মৃত্যুঞ্জয়ের পরিণতি-চিত্র উজ্জ্বল। তার মধ্যবিত্ত স্তর পেরিয়ে ক্রমশ সর্বহারাদের স্তরে নেমে আসার বিষয়টি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-দর্শনের পোষকতা করে। মৃত্যুঞ্জয় উচ্চবিত্ত অফিস চাকুরে। যেসব শিক্ষিত মানুষ কাগজ পড়ার আর অন্যের কাছে জেনে-নেওয়ার কথার বিলাসিতায় নিজের স্তরের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করে, মৃত্যুঞ্জয় তাদেরই দলে ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে একটিমাত্র ঘটনার সাক্ষী করে নামিয়ে এনেছেন সেই বিলাসী সুবিধাবাদী স্বার্থপর স্তর থেকে। গল্পের শুরুতে সে সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ নয়। সে যে স্তরের মানুষ, তাতে প্রত্যক্ষ মৃত্যু দেখারও প্রতিক্রিয়া সাময়িক হয়েই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের তা হয়নি। এখানেই সে নায়ক- শিল্পের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা ব্যক্তিত্বের। যে অবজ্ঞার সঙ্গে একটু ভালোবাসে একই অফিসের সহকর্মী নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে, সেই অবজ্ঞার ব্যাখ্যার মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয়ের নায়কোচিত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আছে। 'মৃত্যুঞ্জয় শুধু নিরীহ শান্ত দরদী ভালমানুষ বলে নয়, সৎ ও সরল বলেও নয়, মানব সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে পচা ঐতিহ্য-আদর্শের কল্পনা-তাপস বলে।' বস্তুত লেখকের ভাষায়- 'মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্লথ, নিস্তেজ নয়।' এইসব মানস-ভঙ্গির কারণেই মৃত্যুঞ্জয়ের মানবিক বোধ বড় জাতের। সে স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব, অ-মানবিক হতে পারেনি, জানে না- এখানেই সে মধ্যবিত্তদের মধ্যে থেকেও মনে মধ্যবিত্ত নয়। আর এই কারণেই তার ক্রমশ নীচে নেমে আসা সম্ভব হয়েছে। সমগ্র গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের যে তৎপরতা তা নিজেকে খোঁজারই নামান্তর। 'সহরের আদি অন্তহীন ফুটপাত ধরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ...ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ্য করে। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার বার অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে।' এই সন্ধানের মধ্যে তার লব্ধ অভিজ্ঞতা হল, ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের। '...ঝিমানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনী। কারো বুকে নালিশ নেই, কারো মনে প্রতিবাদ নেই।'

মৃত্যুঞ্জয় অবশ্যই এদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সর্বাহারাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়নি গল্পের শেষে। তার মধ্যবিত্ত মর্যাদা, আত্মসংযমবোধ, বাঁচার বাসনা স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত হয়েছে তার জীবনে। তার বাস্তব অভিজ্ঞতা নিখিলের থিওরিসর্বস্ব যুক্তির কাছে একেবারেই নিষ্ফল। মৃত্যুঞ্জয়কে সর্বাহারাদের মধ্যে নিয়ে এসে লেখক মানবজীবনবোধের ব্যক্তি থেকে সমষ্টির গুরুত্বকে স্পষ্টত বেশি মূল্য দিয়েছেন। ব্যক্তি না, সমষ্টিই বড় এবং তাদের মধ্যে ব্যক্তির বিলোপ না হলে বুর্জোয়া শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্যাটার্ন বদলানো যাবে না। মৃত্যুঞ্জয় চরিত্র লেখকের সেই বিশ্বাসকেই প্রোথিত করে। চরিত্রটি উচ্চ-মধ্যবিত্ত থেকে সর্বহারাদের, অসহায় নিরন্নদের মধ্যে এসে নেমেছে- এখানেই চরিত্রটির শিল্পসম্মত ক্রমপরিণতি! মৃত্যুঞ্জয় দূর্বলচিত্ত কিংবা ভাবপ্রবণ ব্যক্তি নয়, অথচ তাঁর মনে এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও আদর্শবাদের প্রতি মমত্ব রয়েছে। মৌমাছি যেমন কাচের মধ্যে বদ্ধ হয়ে পড়লে ছটফট করতে থাকে মুক্তির আশায়, ঠিক সেভাবেই যেন মৃত্যু-দৃশ্য দেখে আসা মৃত্যুঞ্জয় এই ঘটনার সমাধান ভেবে ভেবে তল খুঁজছিল, কিন্তু কিছুতেই সে সফল হচ্ছিল না। সে ভাবতে চেষ্টা করছিল যে মৃত্যুর যন্ত্রণা নাকি ক্ষুধার যন্ত্রণা কোনটা বেশি পীড়াদায়ক।

মৃত্যুঞ্জয় সম্ভবত সাম্যবাদী চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। সে বিশ্বাস করতে এই দুনিয়ায় একজন উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী যদি ভাত খেতে পায়, তাহলে একজন মজুরেরও ভাত পাওয়া উচিত। সমাজে যতক্ষণ অন্ন-বস্ত্রের যোগান আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সমবন্টন হওয়া উচিত। তাছাড়া মৃত্যুঞ্জয় মনে করত একজন মানুষ অভুক্ত থেকে যদি অন্য একজন ভরপেট খেয়ে তার স্বাভাবিক

জীবনযাপনে মগ্ন থাকে তবে তা ঘোর অন্যায়। এই আদর্শ আসলে সাম্যবাদের আদর্শ। কিন্তু পুঁজিবাদী সভ্যতায় ক্ষমতাবানেরাই সম্পদের অধিকারী হন এবং সমাজের বাকিরা অভুক্তই থাকেন। এই সমাজ ব্যবস্থায় ধনী হয় আরো ধনী এবং দরিদ্রের পরিণতি হয় মৃত্যু অথবা আত্মহত্যা। অফিসে এসে মৃত্যুঞ্জয় তাই ভেবেই যাচ্ছিল তাঁর নিজের বেতনের সব টাকা খরচ করেও এত এত মানুষের পেটে ভাত জোগাড় করতে পারবে না সে। এই অমোঘ সমস্যার সমাধান তাঁর কাছে নেই জেনে ধীরে ধীরে সে নিজেকেও এই সমস্যার সঙ্গী করতে তুলতে চায়। নিরন্ন মানুষের মুখগুলো তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। স্বাভাবিক জীবনযাপনে ছেদ পড়ে তাঁর। এমনকি স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনাও অপসৃত হতে থাকে তাঁর মন থেকে। অফিসে নিখিল তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নিখিলের মানসিকতার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিকতার অনেক অমিল থাকলেও তাঁদের বন্ধুতা লঘু হয়নি। চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে সে অফিস যাওয়াই বন্ধ করে দেয়। নিখিল অফিসে তাঁর ছুটির ব্যবস্থা করে এবং নিজে অফিস ছুটির পর মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যায়।

নিখিল চরিত্রটি 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের টুনুর মায়ের মতোই স্বল্প পরিসরে অঙ্কিত হলেও তার উপস্থিতি মৃত্যুঞ্জয়ের নায়ক-স্বভাবকে উজ্জ্বল করার জন্যই। 'নিখিল রোগা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং একটু অলস প্রকৃতির লোক।' তার জীবনে আছে বই পড়ার ও সেই সূত্রে শিক্ষিত মনের জগৎ নির্মাণের সুগভীর বাসনা। এ সবই মধ্যবিত্ত সমাজের এক বিলাসিতা। ফুটপাতে অনাহারে মৃত্যু তার কাছে অতি সহজবোধ্য ব্যাপার। সহকর্মী হিসেবে মৃত্যুঞ্জয়কে সে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধাও করে। প্রতি মাসে নিখিল তিন জায়গায় অর্থসাহায্য পাঠায়, মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক বিকৃতি দেখা দিলে তাঁকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু এর মধ্যেই নিখিলের বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যায় যখন সে তাঁর দেয় অর্থসাহায্যের পরিমাণ এই দুর্ভিক্ষের বাজারে পাঁচ টাকা করে কমাতে চেয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়কে সে জানিয়েছে- 'নিজেকে না খাইয়ে মারা পাপ।' মৃত্যুঞ্জয় ত্রাণ-তহবিলে বেতনের পুরো টাকাটাই দান করতে চাইলে তার প্রতিবাদ করেছে নিখিল। নিখিল তাঁকে বুঝিয়েছে যে সমাজনীতির দিক থেকে দশজনকে হত্যার চেয়ে নিজে না খেয়ে মরা অনেক বেশি অপরাধ। কিন্তু নিখিলের এই চিন্তাধারাকে মৃত্যুঞ্জয় 'পাশবিক স্বার্থপরতা' বলে চিহ্নিত করেছে। অথচ নিখিল কিন্তু আদপে স্বার্থপর ছিল না। নিখিল এর জবাবে বলেছে যে সত্যই যদি নিরন্ন মানুষদের মধ্যে পাশবিক স্বার্থপরতা থাকতো, তাহলে তালা বন্দি গুদাম থেকেও চাল ছিনিয়ে খেয়ে নিতো তাঁরা। নিখিল চরিত্র টিপিক্যাল মনোবিলাসী মধ্যবিত্ত -যারা স্বার্থপর, নিজেকে বাঁচানোর কারণে অ-মানবিক। নিখিল মৃত্যুঞ্জয়ের সফল *contrast*।

নিখিল বহু বুঝিয়েও মৃত্যুঞ্জয়কে স্বাভাবিক স্রোতে ফেরাতে পারে না। মৃত্যুঞ্জয় অবাক হয়ে দেখে সকলেই তাঁরই মত দুর্ভাগ্য-পীড়িত, হতাশাগ্রস্ত; অথচ কারো মুখে এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদের স্বর নেই, অভিযোগ নেই। শেষ পর্যন্ত সেই সব নিরন্ন সর্বহারাদের একজন হয়ে ওঠে মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের চেহারাতেও পরিবর্তন আসে। সিল্কের জামাটিও তাঁর গা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, পরনে উঠে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া। সমস্ত গা ধুলো-মাটি মাখা, মুখ ভরে ওঠে দাড়িতে। শেষে দেখা যায় ছোট একটা সরা হাতে সেও অন্যান্য বুভুক্ষু মানুষদের সঙ্গে ফুটপাতে থাকে আর লঙ্গরখানায় কাড়াকাড়ি করে খিচুড়ি খায়। মৃত্যুঞ্জয় বলতে থাকে - 'গাঁ থেকে এইচি। খেতে পাইনি বাবা। আমাকে খেতে দাও।' মৃত্যুঞ্জয়ের এই মানসিক পরিবর্তনই গল্পের মুখ্য উপজীব্য। আমাদের মন আয়নার মত, বাইরের সমস্ত ঘটনার ছাপ তাতে বিম্বিত হয়। কিন্তু সেইসব ঘটনার প্রেক্ষিতে মনে একেক রকম প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। সেই প্রতিক্রিয়া যদি বিধ্বংসী রূপ নেয়, তবে তা ব্যক্তির মানসিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দিতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই একটিমাত্র প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে ডুব মেরেছেন মৃত্যুঞ্জয়ের মনের গহনে। তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসে মনঃসমীক্ষণের একটা বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। আয়নার ওপারের ঘৃণ্য পারদের আস্তরণটা তিনি যেন তুলে আনেন তাঁর লেখায়। সমাজের ক্ষতভরা মুখটাকে আয়না তুলে দেখাতে চান তিনি।

মৃত্যুঞ্জয়ের এই মানসিক বিবর্তনকে মনোবিজ্ঞানী পাওলভের ভাষায় 'ডায়নামিক স্টিরিওটাইপ' *(Dynamic Stereotype)* বলা হয়। সমাজ ও প্রকৃতির নানাবিধ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সহজাত এক ক্ষমতা রয়েছে মানুষের মধ্যে। পুরনো অভ্যাস ছেড়ে নতুন অভ্যাস গড়ে জীবনে আগামীর পথে এগিয়ে চলে মানুষ। মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে ব্যষ্টিচেতনা *(Individualism)* আসলে পরিণত হয়েছে সমষ্টিচেতনায় *(Collectivism)*। যখন চারদিকে দুর্ভিক্ষ আর মড়ক ছেয়ে গেছে, সেই সময় চারবেলা পেটপুরে খাওয়ার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সামাজিক অপরাধ বলে মনে করেছে। পাভলভীয় মনস্তত্ত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর ব্যবহারে। তাই হয়তো সে নিজের খাওয়া কমিয়ে বেতনের পুরো টাকাটা নিরন্ন মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে নিজেও শেষে লঙ্গরখানার এক অতিরিক্ত নিরন্ন অন্নপ্রার্থীতে পরিণত হয়। মানুষকে কেন নিরন্ন বুভুক্ষু অবস্থায় ফুটপাথে মরে পড়ে থাকতে হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নিজেও একজন নিরন্ন মানুষে পরিণত হওয়াটা একেবারেই যুক্তিসম্মত নয়। সঠিক পথ হওয়া উচিত

নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও বাঁচানো। পাভলভ বলছেন পুঁজিবাদী সমাজের অস্বাস্থ্যকর উদ্দীপক বা ঘটনার প্রভাবে সাময়িকভাবে অসুস্থ পরাবর্ত প্রতিক্রিয়া জন্ম নিতে পারে। যে সকল ব্যক্তির নিজের বিচারবুদ্ধি রয়েছে, তার সেই সমাজে নিজে থেকেই সুস্থ থাকতে পারেন। কিন্তু নিজস্ব বিচারবোধ লুপ্ত হলে তার মানসিক বিবর্তন ঘটে। একই ঘটনা ঘটেছে এই গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষেত্রেও। অনাহারে মৃত্যুর কোনো প্রতিকারই কী মৃত্যুঞ্জয় নিজে করতে পারবে না ? এই এক প্রশ্ন তাঁর মানসিক স্থিতি নষ্ট করেছে। এর ফলেই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচ্য গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের এই চিন্তার বিকৃতিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। মৃত্যুঞ্জয় এক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় নিউরোসিস-এ আক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ বাইরের পরিবেশের চাপে মৃত্যুঞ্জয়ের স্নায়ুতন্ত্রের শক্তি ও সহনশীলতার মাত্রা অতিক্রম করে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে তাঁর। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, যে সকল ব্যক্তিকে অনবরত এক বিষয় থেকে পৃথক বিষয়ে মনসংযোগ করতে হয় কিংবা পরস্পরবিরোধী কোনো আদর্শ নিয়ে কাজ করতে হয় অথবা যাদের চিন্তাধারা ও নিত্যদিনের জীবনযাপনের মধ্যেই এক ধরনের স্ববিরোধিতা বর্তমান, তাদের ক্ষেত্রে অতিপীড়নের ফলে এই ধরনের মনো-বিকৃতি ঘটতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

জীবনদর্শনের উপযোগী ব্যক্তিত্বও এমন বৈজ্ঞানিক স্বভাবে স্পষ্ট হয়েছে। অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের মধ্যে থেকে সর্বহারা মানুষদের দলিত মথিত মানবতাকে বড় করা যাবে না। বুর্জোয়া খোলসটিকে অবলীলায়, নির্মোহ মানসিকতায় ত্যাগ করতে হবে, শোষিত শ্রেণীর সঙ্গে সমান স্বভাবে নিহিত হতে হবে, তবেই মানবভাগ্যের যথার্থ পরিশীলন সম্ভব। মেকি মানবতা দরদ নিষ্ফল- যেখানে মানবতাবোধ সর্বধ্বংসী মানব- রাক্ষসের সম্মুখীন। এই ভাবনাই 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের অন্তর্নিহিত সত্য। কোনো সমালোচক মৃত্যুঞ্জয়ের মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা বলতে পারেন। বলতে পারেন, গল্পটি 'মৃত্যুঞ্জয়ের বিকারের সার্থক শিল্পরূপ।' কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে জীবনবাদী, মানবপ্রেমিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নের জন্য তুলনাহীন হাহাকারের সময় মানুষের বিকার-বিলাস নিয়ে গল্প লিখতে বসবেন এটা একান্তই অসম্ভব মনে হয়। এ গল্পের জন্ম-প্রেরণা আদৌ অতি সাধারণ ভাবকেন্দ্র থেকে নয়। একটি বড় সমাজ-ন্যায়ের, বড় অর্থে বৃহত্তর মানবিক সম্পর্কে বড়, চিরকালের, চমৎকার শিল্পব্যঞ্জনাই এই গল্পে একমাত্র লক্ষ্য। এ গল্পের কেন্দ্রে বিকারগ্রস্ততার অনুসন্ধান সমালোচকদের অবুঝ বুদ্ধিভ্রংশতাই প্রমাণ করে। মৃত্যুঞ্জয়ের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ তার বিকার নয়, মধ্যবিত্তদের দিক থেকে, সর্বহারাদের দিক থেকে সর্বহারাদের বৃহত্তর সমাজের সামীপ্য গ্রহণের মতো চরম সোশিয়ালিস্টিক ভাবনাই তার ভিতরের শক্তি।

CONCLUSION: গল্পের এমন নামে ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যেন বলতে চেয়েছেন- যে বাঁচায় সে কি নিজে বাঁচে! চরিত্রই এ গল্পের মৌল ভাব-প্রতিষ্ঠার একমাত্র আধার। সেই চরিত্র নামে নেই, নেই কোনো বিশেষ ঘটনা বা কাহিনী-সূত্রে। জীবন-অস্তিত্বের মূল ধরে টান দেওয়ার ভাষা ব্যবহার করেছেন গল্পের নামে। হোক ব্যাখ্যামূলক, কিন্তু গল্পের নামেই একটি বিস্ময়সূচক চিহ্ন দিয়ে লেখক ঈষৎ শ্লেষমিশ্রিত প্রশ্নও রেখেছেন বুঝি। দ্বিতীয় কথা হল, মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রের অসহায়তাবোধক ভাবের প্রকাশকে ধরার জন্যই গল্পের নামে এমন বিস্ময়বোধক চিহ্ন প্রয়োগের ব্যঞ্জনা থাকতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগ্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, ছিলেন না ঈশ্বরেও, সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়ের তথা শোষিত মানুষদের বাঁচার প্রশ্নে ভাগ্যের স্বীকৃতির কোনো ইঙ্গিত এখানে নেই! নেই অলৌকিক ঈশ্বরের কাছে কোনো করুণ আবেদনও। বরং লেখকের নিজস্ব একটি অনুসন্ধিৎসু মনের ব্যঞ্জনাগর্ভ স্বভাব নামে থেকে যেতেও পারে। গল্পের মধ্যে অন্নহারা মুমূর্ষু লোকদের দেখে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সিদ্ধান্তে আছে- 'কারো বুকে নালিশ নেই, কারো মনে প্রতিবাদ নেই। কোথা থেকে কিভাবে কেমন করে সব ওলট-পালট হয়ে গেল তারা জানেনি, বোঝেনি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।' আর এইসব লোকদের ভিড়ে মৃত্যুঞ্জয়কে এনে লেখক প্রকারান্তরে 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!'-র নামের তাৎপর্যে অতি গভীর ব্যঞ্জনায় তাদের বাঁচার উপযোগী নালিশ, প্রতিবাদের কথাটায় দৃষ্টি রেখেছেন। বাঁচতে হলে তার শক্তি এদের হাতেই, আর বাঁচাতে হলে তারাই পারবে নিজেদের বাঁচাতে। সুতরাং নামে কোনো হতাশা নয়, শূন্যতার বোধও নয়, পরোক্ষে নিরন্নদের ভিড়ে মৃত্যুঞ্জয় সমেত সমস্ত মানুষকে বাঁচার সূত্রটুকু ধরিয়ে দেওয়ার সুদূর-প্রসারী ব্যঞ্জনা পাঠকহৃদয়ে দেখা দিতেও পারে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. চক্রবর্তী যুগান্তর (২০০৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

২. রায়চৌধুরী গোপিকানাথ (২০০৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩. মিত্র সরোজমোহন (১৯৮২), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, গ্রন্থালয়, কলকাতা।

৪. বসু নিতাই (১৯৮৬), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫. ঘোষ শিখা (১৯৯০), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবয়বগত বিশ্লেষণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

৬. দে আশীষকুমার (১৯৯৩), মাণিকের ছোটগল্প : শিল্পীর নবজন্ম, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায় মধুমিতা (২০০০), মাণিকের ছোটগল্পে মনস্তত্ব, দি জেনারেল বুকস, কলকাতা।

৮. বসু কৃষ্ণা (২০০৩), ছোটগল্পকার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পরূপ ও জীবনবোধ, প্রতিভাস, কলকাতা।

৯. হক সৈয়দ আজিজুল (১৯৭৮), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজ চেতনা ও জীবনের রূপায়ন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১০. ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু (২০২০), ছোটগল্পে ত্রয়ী : তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ মানিক বন্দোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা।

১১. ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব (১৯৯৯), পুড়ে যায় জীবন নশ্বর, গণশক্তি, কলকাতা।

১২. রায়চৌধুরী বিনতা (১৯৯৭), পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

১৩. মুখোপাধ্যায় শ্যামাপ্রসাদ (১৯৪৪), পঞ্চাশের মন্বন্তর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৪।

১৪. Sen Amartya (1998), Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press, India.

১৫. Rangaswamy R. (2006), A Text Book of Agricultural Statistics, New Age International (P) Limited Publishers, New Delhi.

Citation: প্রামানিক.ম. (2023) "**মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!':মন্বন্তরের উপাখ্যান ও মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক বিবর্তন**", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-1, Issue-1 Dec-2023..